বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঐতিহাসিক ঘোষণা পাঠ

মোহাম্মদ ওমর ফারুক দেওয়ান

১৬ই এপ্রিল। উনিশশো একাত্তর সাল। রাত দশটা। মুজিব নগরে একটি বাড়িতে বসে আছেন অধ্যাপক ইউছুফ আলী। সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন। এসেই বললেন- কালকে অধ্যাপক ইউছুফ আলীকেই স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করতে হবে। এটা সকলের সিদ্ধান্ত। তৈরি থাকার অনুরোধ করে বেরিয়ে গেলেন, অপেক্ষা করলেন না। অধ্যাপক ইউছুফ আলী চমকে উঠলেন। তাঁর মনের পর্দায় ভেসে উঠলো- সাড়ে সাত কোটি মুক্তিপাগল বাঙালির স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র তিনি পাঠ করছেন যা আগামীকাল বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে দখলদার পাকবাহিনী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। প্রতিশোধ নিতে চাইবে। তখনো তাঁর মা, স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন দিনাজপুরে আছে বলেই শুনেছেন। তবে কেমন ও কি অবস্থায় আছে জানেন না। তাই তাঁর ভয়- দস্যু বর্বর বাহিনী ক্ষেপে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের উপরই প্রতিশোধ নিতে পারে। সাথে সাথে মনে এক অনাস্বাদিত অনুভুতিও জাগে তাঁর মনে- বিশ্বে ক'জনার ভাগ্যে এ সুযোগ আসে। একটি নতুন জাতির স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠের গৌরব- এতো তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ১৭ ই এপ্রিল বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে তাঁরই কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঐতিহাসিক ঘোষণা।

সে রাতে তাঁর ভালো ঘুম হয়নি। একটা অস্থিরতা তাঁকে পেয়ে বসে। মনে আসে নানা কথা, নানা স্মৃতি। বাংলাদেশ স্বাধীন হতে যাচ্ছে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু আজ কোথায়? কেমন আছেন? আদৌ বেঁচে আছেন কিনা? তিনি এখন তাঁদের মাঝে নেই- একথা বিশ্বাস হতে চায় না। তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত প্রতিটি নির্দেশ কানে বাজছে। মনে হলো, এই তো বঙ্গবন্ধু, কাছেই আছেন। পাশের ঘরেই হয়ত, ডাক পড়বে। নির্জন কক্ষে শুয়ে এসব ভাবছেন তিনি। চোখে ঘুম নেই, প্রতিটি মুহূর্তেই একটি নতুন অনুভূতি। কতকগুলো মুখ তাঁর চোখের সামনে ভাসছে। তাঁর মা, স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে ভাই-বোন। ভাসছে গ্রামের মানুষের মুখ। বাংলাদেশের মানুষের মুখ তিনি দেখতে পাচ্ছেন। স্মৃতির উত্তাপ বাড়ছে, বাড়ছে অস্থিরতা। সত্যি কথা হলো সেদিনের কথা ভাবতে গেলেই তিনি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়তেন হয়ত এ তাঁর দুর্বলতা, হয়ত নয়। কিন্তু এটি ছিল তাঁর জীবনের মধুরতম স্মৃতি।

পরদিন সকালেই উঠে পড়লেন। তবে বিপদ একটা ঘটলো। তাঁর পরনে তো লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি। তাও ধোয়া নয়। সাথে দ্বিতীয় কোনো কাপড় নেই। এখন উপায়! ছুটে গেলেন কামারুজ্জামান সাহেবের আস্তানায়। তাঁর অবস্থা শুনে কামারুজ্জামান সাহেবের মুখেও ম্লান হাসি। তিনি বললেন এক সেট পাঞ্জাবি আছে বটে তবে মাপে বড়ো হবে। তবুও রাজি হয়ে গেলেন ইউসুফ সাহেব। পাঞ্জাবির দুটো পকেটই ছিল ছেঁড়া। সাত-আটদিন সেভ করেননি। খোচা খোচা দাড়ি। পরে দেখলেন অন্যদের অবস্থাও প্রায় এক।

১৭ই এপ্রিল বেলা দশটার দিকে তারা গাড়িতে মেহেরপুরের বৈদনাথতলায় পৌঁছান। সুদৃশ্য আম্রকাননে বিরাট মঞ্চ। মঞ্চের উপর দুটো টেবিল। সাতখানা চেয়ার পাতা রয়েছে। মঞ্চের তিন পাশে কয়েকশো চেয়ার ও বেঞ্চ। মঞ্চের ঠিক সামনে কিছুটা জায়গা চাদর বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। একপাশে এমএনএ ও এমপিএগণ, একপাশে দেশি-বিদেশি সাংবাদিক ও প্রেস ফটোগ্রাফার আর সামনে কয়েক হাজার মানুষ।

বৈদনাথতলা বর্ডার আউটপোস্টে তারা চা বিস্কুট খেয়ে নিলেন। স্থানীয় সশস্ত্র জোয়ানবাহিনী ও আওয়ামী লীগ কর্মীরাই এর ব্যবস্থা করেছেন। কয়েকজন বাঙালি তরুণ সিভিল অফিসারকেও দেখতে পেলেন। তাদের মাঝে দু'জন হলেন- তৌফিক-ই-এলাহী ও ক্যাপ্টেন মাহবুবউদ্দীন।

চা পানের মধ্যেই অস্থায়ী রাষ্ট্র প্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্বাধীনতার ঐতিহাসিক ঘোষণার পাতাটি তাঁর হাতে দিলেন। আর বললেন, এটি এক্ষুণি বাংলায় অনুবাদ করে নিতে। তিনি দেখলেন ঘোষণাটি ইংরেজিতে টাইপ করা। তখন হাতে একদম সময় নেই। সবাই একে একে আম্রকাননের মঞ্চের দিকে চলে গেলেন। অধ্যাপক ইউছুফ আলী ও বরিশালের এমপিএ জনাব নুরুল ইসলাম ঘোষণাটি বাংলায় অনুবাদ করছিলেন। অনুবাদ কেমন হয়েছে সেদিকে খেয়াল নেই। সময় যে দ্রুত পার হয়ে যাচ্ছে। বেশি দেরি করা চলবে না। একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠান শেষ করতেই হবে।

এমন সময় ছাত্রনেতা আ স ম আব্দুর রব দৌড়ে এসে অধ্যাপক ইউছুফ আলীকে বললেন, "স্যার, জাতীয় সংগীত তো কেউ গাইতে জানে না। আপনাকেই গাইতে হবে।"

অধ্যাপক ইউছুফ আলী কয়েকটি ছেলেকে নিয়ে আসতে বললেন। আব্দুর রব আবার দৌড়ে গিয়ে চার পাঁচজন ছেলেকে এনে তাঁর সামনে উপস্থিত করলেন। বিনা হারমোনিয়ামেই ওদের নিয়ে তৎক্ষনাৎ বসে গেলেন। একটি কাগজে আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি- গানের প্রথম আট লাইন লিখে ওদের হাতে দিলেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সুরটা তুলে ওদেরকে প্রস্তুত করে নিলেন এবং বললেন, "জাতীয় সংগীতের পরই আমার ঘোষণা পাঠ থাকবে। তাই তোমাদেরই গাইতে হবে।"

অতিথিবৃন্দ ও সাংবাদিকদের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হলো। বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল কমান্ডের পক্ষ থেকে ক্যাপ্টেন মাহবুব এবং ক্যাপ্টেন এলাহী আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন জানান। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে গার্ড অভ অনার প্রদান করা হয়।

মঞ্চ থেকে পবিত্র কোরআন পাঠের সুর এল। তারা দ্রুত পায়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। অনুবাদ কপিতে যথেষ্ঠ কাটাছেড়া রয়েছে। কিন্তু ভালো করে লেখার তখন আর সময় নেই।

মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, পররাষ্ট্র মন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ, মন্ত্রিপরিষদের সদস্য মোহাম্মদ মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামারুজ্জামান। সবার ডানে রয়েছেন প্রধান সেনাপতি কর্নেল আতাউল গণি ওসমানী।

কোরআন তেলাওয়াত এর পর জাতীয় সংগীত। সমবেত কণ্ঠে যখন ‘আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি’ গানের সুর তখন অলক্ষ্যে অধ্যাপক ইউছুফ আলীর চোখে অশ্রু। তিনি লক্ষ্য করে দেখলেন- সবার চোখই অশ্রুসিক্ত। সে এক অনন্য মুহূর্ত। অনাস্বাদিত উষ্ণ অনুভূতি।

এরপরই টাঙ্গাইলের এমএনএ আবদুল মান্নান স্বাধীনতার ঐতিহাসিক ঘোষণা পাঠ করতে অধ্যাপক ইউছুফ আলীকে আমন্ত্রণ জানালেন।

হঠাৎ একটি আশ্চর্য পরিবর্তন অনুভব করলেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী। এতক্ষণের ভয়-ভীতি, শঙ্কা, আনন্দ, অস্থিরতা থেকে যেন তিনি নিমিষেই মুক্ত বোধ করলেন। ধীর পদক্ষেপে মঞ্চে উঠলেন। অসংখ্য ক্যামেরা তাঁকে ঘিরে রেখেছিল। তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করলেন। পাঠ শেষে ঘোষণাটি তিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেবের হাতে অর্পণ করেন। তখন বেলা আনুমানিক এগারোটা। মন্ত্রিপরিষদের সকলে পরস্পর হাতে হাত মিলালেন। তখন তুমুল করতালি।

এরপরই অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম তেজোদ্দীপ্ত ভাষণ দেন। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের নবগঠিত বাংলাদেশ সরকারের বৈদেশিক নীতির ব্যাখ্যা দেন। ওইদিন বিদেশি সাংবাদিকরা একটা চাতুর্যপূর্ণ প্রশ্ন করেন, ‘‘বাংলাদেশের রাজধানী কোথায়’’? তাজউদ্দীন উত্তর দিয়েছিলেন যে, ‘‘মুজিবনগর’’। ২২শে ডিসেম্বর বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তর না হওয়া পর্যন্ত ঘোষিত রাজধানী ছিল ‘‘মুজিবনগর’’।

এরপর চারদিক থেকে হাজারো কণ্ঠে উচ্চারিত হলো- ‘জয় বাংলা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জিন্দাবাদ’। স্লোগানের ধ্বনি আছড়ে পড়ছে আম্রকাননে, পড়ছে সমবেত সবার হৃদয়ে। সাগরের কল্লোল জাগে সবার প্রাণে। হৃদয়ের উষ্ণ আবেগে একে অন্যকে বুকে টেনে নেয়। মাথার উপর মধ্যাহ্নের সূর্য যেন আলোর স্পর্শে আশীর্বাদ করলো সবাইকে।

#

লেখক-প্রকল্প পরিচালক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর

১৩.০৪.২০২২ পিআইডি ফিচার